

# অভয়ের অনিদ্রা

(গল্পগ্রন্থ - বিধু মাস্টার)

অভয়ের সারারাত্রি ঘুম হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না। সেই যে আচমকা কিসের যেন শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল, তার পর আর কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। চক্ষু যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বেশ শান্তিতে সে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ কে যেন তাহার দ্বারে করাঘাত করিয়া গেল। সেই শব্দে অভয়ের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠিল। অভয় ধীরে ধীরে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণপ্রায় হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চারিদিকে সাবধানে চাহিয়া দেখিল। না, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য ঘটে নাই। যেখানকার জিনিসটি যেমন ছিল তাহা ঠিক সেখানেই আছে, এতটুকু নড়ে নাই। অভয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভয় তাহার নিশ্চয় অহেতুক। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, হয়তো ডাকাত পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হইল ইহা কলিকাতা, ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই আদৌ। তার পর মনে পড়িল, হয়তো চোর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিল। চোরের আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কিসের এই বিকট শব্দ ? অভয় ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল।

মুহূর্তে তাহার পাশের শূন্য বিছানায় নজর পড়িল। সাতদিন আগে ওই শয্যা পূর্ণ ছিল। সাতদিন আগে তাহার এ গৃহ এমন মহাশূন্যতা প্রকট করিয়া খাঁ খাঁ করিত না। মনে পড়িল বেচারার বকুলের কথা—তাহার সহধর্মিণী, তাহার স্ত্রী, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বছর পূর্বে এই শ্রাবণের এক শুভলগ্নে বকুলকে সে সগোত্রের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সেদিনও আকাশে এমনি করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন তাহার মা ছিলেন। দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। তার পর একদা পরপার হইতে মার ডাক পড়িল। বকুল নিপুণ হস্তে সংসারের হাল টানিয়া ধরিল। অভয় তাহার পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতার অভাব বকুলকে দিয়া পূরণ করা হইল। প্রথম প্রথম বকুলকে অবশ্যই বেগ পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই সে অভ্যস্ত হইয়া গেল। সংসারের হিসাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্যন্ত তাহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত।

কালক্রমে বকুলস্বামীর বিরাট বহুবিস্তৃত সংসারের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল যে তাহার অভাব একদিনও সহ্য করা যাইত না। বাপের বাড়ি যাইবার ফুরসত সে পাইত না। ভোর হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত কর্মে তাহার বিশ্রাম ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায় সে অক্লান্ত কর্ম করিয়া যাইত। একবেলা তাহার অসুখ করিলে সংসার অচলপ্রায় হইয়া যাইত। ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। অতিথি-অভ্যাগত ফিরিয়া যাইত। খাদ্যদ্রব্য এমনই অখাদ্য হইত যে কাহারও মুখে তুলিবার রুচি হইত না। পাশের বাড়ির চাঁপা একদা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বকুলকে দেখিয়া বলিল, দিদির চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেল !

বকুল কহিল, হবে না ভাই ? যা খাটুনি !

চাঁপা কহিল, খাটুনি একটু কম করতে পারো !

বকুল মৃদু হাসিল, তাহার মুখে প্রশান্তির ছায়াপাত হইল। সে বলিল, খাটুনি কম করব কি করে ভাই ! নিজের সংসার, পর তো আর কেউ নয় ! একটুকু বিশ্রামের ফুরসত নেই। আজ যদি যম আমায় নিতে আসে তাহলে তাকে বলব, একটু বোসো, আমার এখনো অনেক কাজ বাকি।

চাঁপা কহিল, বালাই যাট, ওকি অলক্ষুণে কথা ভাই !

বকুল কহিল, আমার আবার লক্ষণ অলক্ষণ। আমি যমের অরুচি !

এহেন বকুলকে পাইয়া অভয়ের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অভয় বকুলকে নিঃশব্দে চুপিচুপি নাকি ভালোবাসিয়াও ফেলিয়াছিল। কেননা যে অভয় বন্ধুদের ফেলিয়া একদণ্ড কাটাইতে পারিত না, সেই কিনা বিবাহের পর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হইয়া গেল। গৃহকেই সে যথাসর্বস্ব জানিয়া ফেলিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতে কসুর করে নাই। বলিল, বউদি তোকে এমন করে তুক করে ফেলবে জানলে কখনো বিয়ে করতে দিতুমনা !

কেহ বলিল, বউদির দেওয়া খাবার-টাবার দেখে খাস বাবা !

কেহ বলিল, কামরূপ-কামিখের ভেড়া হয়ে যাস নে যেন !

অভয় কেবল হাসিতে লাগিল। কাহারও কথার সে জবাব দিল না।

এমনি করিয়া অভয়ের দিন কাটিতে লাগিল ! বন্ধুরা ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহাকে সকলে বিস্মৃত হইল। আপিসের ছুটি হইলে সন্ধ্যায় বা রবিবারে, কেহ তাহার বাড়ি আর তাসপাশা খেলিতে আসিত না। তাহার বহুদিনের বৈঠকখানা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল না, বৈকালে ঝাঁট পড়িল না, অভয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, ওরা আর তাস খেলতে আসে না কেন ?

অভয় মুক্তির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন বিলাসিতা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

বকুল কহিল, এতদিনের অভ্যেস !

—অভ্যেস বলে তো সব-কিছু করা যায় না। পয়সা চাই—চকচকে পয়সা। তাস চাই, আলো চাই, চা চাই, বিস্কুট চাই। পয়সা দিয়ে তো অমন বন্ধুত্ব কিনতে পারি না বকুল। পয়সা কোথেকে আসে সে কথা কি কোনোদিন চিন্তা করেছ একবার !

কথা শেষে অভয় হা-হা করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। বকুল বলিল, আমার বিয়ের পর তার এমনি করে যবনিকাপাত করলে আমায় লোকে দুষবে, এটা জানো তো ?

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ লোকে মনে করবে তাদের এ আনন্দ রুদ্ধ হয়েছে আমারই ষড়যন্ত্রে।

অভয় আবার সেইরূপ সারা ঘরটি কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, ওঃ ! দুষবে তো তোমায় ? তা যত খুশি দোষ দিক, তুমি তো আর শুনতে যাচ্ছ না। তাতে আর কোনো ক্ষতিনেই।

দুই মাস অভয়ের সহিত ঘর করিয়া বকুল বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহার স্বামীর হাতটানটা বেশই আছে। হাতের আঙুল নাকি তাহার ফাঁক হয় না। বিবাহের পর এই সুযোগে সে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া বসিল। সাবান ম্নো কিনিয়া দিতে বলিলে সে আসিয়া উড়াইয়া দিত, সেকালের দোহাই পাড়িয়া স্ত্রীকে আধুনিকতার বিশেষণে জর্জরিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেই হারানো যুগের সোনার দিনের বর্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। বকুলের মুখে আর কোনো কথা সরিত না। আর তাহার বলিবারই বা কি থাকিত ? তখন তাহার সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিনটি বৎসর কোন্ ফাঁকে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অকস্মাৎ একদিন বকুলের সামান্য অসুখের সামান্য ভাবেই সূত্রপাত হইল। বুধবার রাত্রি দুইটায় সে অভয়কে সহসা ডাকিতে লাগিল। অভয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি ?

বকুল বলিল, আমার বড্ড শীত করছে। উঃ হঃ হঃ ! জানালা দরজা সব বন্ধ করে দাও। আমার ঘাড়ের ওপর লেপ দাও, গায়ের-কাপড় দাও, তোশক দাও, গদি দাও, যা কিছু আছে সব দাও।

অভয় লেপ দিল, গায়ের-কাপড় দিল। বকুলের শীত তবুও তিলার্ধ কমিল না। সে হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চিৎকার করিতে লাগিল—আরো দাও, আরো দাও !

দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তথাপি বকুল কাঁপিতে লাগিল। অভয় তার কপালে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন এই গভীর রাত্রে সে কি করিবে, করিবার তাহার কিই বা আছে ? সে কি ডাক্তার ডাকিবে ? ডাক্তারের কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে শিহরণ জাগিল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকা তো বিলাসিতার নামান্তর। আর রাত্রে নাকি ডাক্তারের ডবল ভিজিট। না, এ সামান্য জ্বরে

মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না। একবার ভাবিল, মাথায় আইসব্যাগ দিবে বা কপালে জলপটি দিবে। কিন্তু কোথায় আইসব্যাগ, কোথায় গুডিকোলন ! এদিকে বকুল চিৎকার করিতে লাগিল—আমার মাথা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

অভয় বলিল, বেশ তো ভালোমানুষ খাওয়া-দাওয়া করে শুলে। হঠাৎ এমন কিই বা অসুখ করল বলো দিকি ? এ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বকুল তখন গান জুড়িয়া দিয়াছে, অনর্গল এলোমেলো বকিয়া চলিয়াছে, সজনী, কি পুছসি...ওই যমুনারি কূলে...শ্যাম কালো, তার কালো মাথার চূড়া, তার মোহন বাঁশি...

অভয় বিপদ গনিল। সারারাত্রি স্ত্রীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। নিজের শরীরের উপর দিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা সে করিতে প্রস্তুত। শুধু এই রাত্রে অযথা সে খামোকা পয়সা খরচ করিতে পারিবে না। পয়সা তাহার বুকুর বত্রিশখানা হাড়ের সামিল। বকুল সারারাত্রি হাসিয়া-কাঁদিয়া-গাহিয়া চিৎকার করিয়া কাটাওয়া দিল। জ্বর কমিল না। ভোর হইলে বাড়ির অন্যান্য লোকজন আসিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে পাড়ার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, টাইফয়েড। রোগ বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রীতিমতো চিকিৎসার প্রয়োজন।

অভয় প্রমাদ গনিল। বিপদ কি মানুষের এমনি করিয়াই হয় ? তাহার বড় ইচ্ছা হইল সে ডাক ছাড়িয়া চিৎকার করিয়া কাঁদে ! কিন্তু সে কাঁদিল না, বরং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মতো না বলিয়া না কহিয়া দশটি টাকা খরচ করিয়া বসিল। হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্কটা হয়তো আরো বড় হইবে; কিন্তু স্ত্রী তাহার ভাগ্যবতী, স্বামী-সোহাগিনী, ‘পতি পরম গুরু’কে অযথা ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিনই সে ইহজগতের মায়া কাটাওয়া গোলোকধামে চলিয়া গেল, সে তাকে বাধা দিতে পারিল না।

অভয় পত্নীশোকে ধূলিতলে আছড়াইয়া পড়িল। সে আতর্কণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার অত সাধের তাসের ঘর মরণের তীব্র আঘাতে ভাঙিয়া-চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেবল তীব্র সুরে শোকপ্রকাশ করিয়া চলিল। সেইসব পুরনো দিনের হারানো বন্ধুরা আজ বিপদ দেখিয়া আসিয়া জুটিল। সেই হাবু, পটল, রমেন, ভূপেন, বিপিন—সকলেই একে একে দেখা দিল। দীর্ঘ তিন বৎসর যাহারা অভয়ের ছায়া পর্যন্ত মাড়াইত না, সকলে যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা বলিয়া ঘোষণা করিত, অযথা হাঁড়ি ফাটিবার আশঙ্কায় সারাদিন সচকিত থাকিত, আজ সেই অভয়ের বিপদে আর তাহারা বেচারার হাত দিয়া জল গলে না বলিয়া দূরে সরিয়া রহিল না। অভয় তাহাদের দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা অভয়ের কান্নাদেখিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা জানে অভয় তাহার স্ত্রীকে কি দারুণ ভালোবাসে, স্ত্রীর অভাবে তাহার জীবন কিরূপ বিষময় হইয়া যাইবে। অগত্যা তাহারা তাকে সাহায্য দিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় শবদাহ শেষ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

সত্যই নাকি অভয় তাহার স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসিত। সে ভালোবাসায় নাকি এতটুকু গলদ ছিল না। উঠিতে বসিতে সব সময়ে সে ‘বকুল’ ‘বকুল’ বলিয়া অস্থির হইত। বকুল হাসিয়া বলিত, আমি মলে তুমি কি করবে বলো তো ?

—শুভ্র তাজমহল।

বকুল হাসিমুখেই বলিত, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি অত খরচ করো না।

অভয় কহিত, পয়সাকড়ি তো সবই তোমার। তোমার পয়সা তোমার জন্যে খরচ করব, তাতে পায়ে পড়ে বাহাদুরি কেনবার কি এমন আছে !

—বেশ, মানলুম সমস্ত পয়সাকড়ি আমার, আমার কলকাতা শহরে চোদ্দখানা বাড়ি, তার মাসিক আটশ টাকা ভাড়া। এখন আপাতত দয়া করে আমার জন্যে একখানা লালাবাই সাবান এনে দাও দিকি।

অভয় তাহার স্ত্রীকে প্রবোধ দিত, পাগল নাকি ! ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে ?না, ও বিলাসিতা আমাদের এখানে চলবে না।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মুহাম্মান হইয়া অভয় ছয় দিন ছয় রাত্রি আহর-নিদ্রা ত্যাগ করিল। বন্ধুরা সকলে বিপদ গনিল। এই নিদারুণ শোকাবেগের হাত হইতে কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে। সকলে সাঙ্ঘনা দিব্য চেষ্টা করিল, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিরহে কাতর মানুষটিকে সেই বহুশ্রুত দার্শনিক মতবাদ দিয়া বুঝাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই—মানুষ মরণশীল, মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করা নাকি দুর্বলতার লক্ষণ, রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত, সরিষা আনিবার জন্য বুদ্ধের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্মরাজ বকের প্রশ্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ কথায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। অভয় তবুও প্রথমটা ভোলে নাই।

ছয় দিন ছয় রাত্রির পর আজ সবে সে পত্নীশোক কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়া সামান্য ঘুমাইয়াছে, এহেন সময়ে সেই বিকট শব্দ হইল। অভয় একদৃষ্টে বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানার ভিতর হু-হু করিয়া উঠিল। ডাকাত নয়, তবে চোর হইলে হইতে পারে।

কিন্তু চোর বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না।

তবে এ কিসের শব্দ ? অভয় দরজার একটি গর্ত দিয়া দেখিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদ সাদা, দীপ্তিময়ী তারকারাশি। অভয় বিছানায় আসিয়া বুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিসের এ শব্দ ?

আচমকা মনে পড়িল হয়ত তাহার মতো স্ত্রীর কীর্তি, হয়তো বেচারী এ জগতের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই ! তাই কি নিঃশব্দ রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে ? তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাহার গা ডোল হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, স্ত্রীর এই উৎকট ভালোবাসা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে লাগিল। বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিবার সাহস আর তাহার রহিল না। সমস্ত শোক-দুঃখ-বেদনা ভয়ে ও ভাবনায় রূপান্তরিত হইল। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর অবশভাবে বসিয়া রহিল। কি সে করিবে ? চিৎকার করিবে, না জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে ? ভাবিয়া সে কুল-কিনারা পাইল না। সে ছেলেবেলায় কত ভৌতিক কাহিনী পড়িয়াছে, আজ কেমন যেন সেই সব নানা ভৌতিক ব্যাপার জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে বন্ধ জানালা-দরজার পানে সচকিত চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কে জানে কোন্ মুহূর্তে দম্কা বাতাসে জানালা-দরজাগুলি ছড়মুড় করিয়া খুলিয়া যায় !

অকস্মাৎ আবার সেই পূর্বের ন্যায় দ্বারে শব্দ হইল। বাহির হইতে মানুষে যেন দ্বারঠেলিতেছে। অভয় ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহিরে তাকাইল। কিন্তু আশ্চর্য, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিল একটি হৃষ্টপুষ্ট ভিটামিনের মাপকাঠির চিহ্নস্বরূপ পাঞ্জাবী হুঁদুর হনহন করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া পলাইয়া গেল !

বিপুল বিস্ময়ে অভয়ের মুখে কোনো কথা সরিল না, কেবল তৃপ্তি ও প্রশান্তির হাসি খেলিয়া গেল। যাহা হউক, যদি ডাকাতই পড়িত বা চোরই আসিত ! কতদিন হইতে সে ভাবিয়াছে গহনাপত্র পয়সাকড়ি অন্যত্র সাবধানে রাখিয়া দিবে, কিন্তু ফুরসত পায় নাই। তাই আজ গুপ্তস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিবে তাহার সবকিছু মজুত আছে কিনা। ধীরে ধীরে সে সিন্দুক খুলিয়া ফর্দ মিলাইয়া তাহার সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। ফর্দ মিলাইতে মিলাইতে তাহার তৃষ্ণা পাইয়া গেল। ভাবিল বকুলকে জল আনিতে বলে, হয়তো বলিতও তাহাকে, যদি না তৎক্ষণাৎ মনে পড়িত তাহার মৃত্যুর কথা। না, একটা চাকর ও একটা ঝি না রাখিলে চলিবে না। বকুল আসিয়া পর্যন্ত সে উহাদের বিদায় করিয়াছিল; কিন্তু আজ তো তাহাদের না হইলে অভয়ের আদৌ চলে না। কম করিয়াও খাওয়া-পরা বাদে তাহাদের জন্য অভয়কে মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বৎসর শেষে এই দশটি টাকা আবার একশ কুড়ি টাকায় পরিণত হইবে ! বাৎসরিক মোটা অঙ্কটা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রি দুইটা বাজিল। অভয় তখন বাক্স হাতড়াইতেছে। তাহার চুল উস্ফোখুস্ফো হইয়া গিয়াছে, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন অস্বস্তির নিশ্বাস পড়িতেছে। গভীর রাত্রেই সে স্ত্রীর শূন্য শয়্যা আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আবার সে বিনাইয়া বিনাইয়া চাপা কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ফটোখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফটো দেখিয়া বকুলকে চেনা মুশকিল। কোন্ মাস্কাতার আমলে ওইখানি তোলা হইয়াছিল। তার পর ফটো তুলিবার প্রয়োজন বা সদিচ্ছা আর তাহার হয় নাই।

দুইটা তিনটা করিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ের চোখে তখনো ঘুম নাই। তখনো সে তাহার দীর্ঘ চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। হয়তো সে পত্নীশোকে বিবশ হইয়া গিয়াছে। শয়্যা হইতে উঠিয়া অভয় ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে অনিমেঘে চাহিয়া রহিল। চাঁদ অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারায় তারায় সারা আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাহার বকের ভিতর সহসা ছ-ছ করিয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম দূরের কথা, সে তাহার বিছানায় শুইতেই পারিল না। শয়্যা তাহাকে কাঁটার ন্যায় বিধিতে লাগিল।

একবার ভাবিল যে লোটাকম্বল লইয়া যেখানে দু-চোখ যায় সেখানে চলিয়া যাইবে? আর সে সংসার করিতে পারে না। সে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হইবার তাহার বাকিই বা কি আছে! বিপদ যখন আসে তখন সে তো আর একা একা চুপি চুপি আসে না। এমন করিয়া অঘটন ঘটিলে সে কি করিয়া বাঁচিবে?

আজ সে যে-শোক পাইয়াছে তাহার কাছে স্ত্রীর মৃত্যুজনিত শোক সম্পূর্ণ তুচ্ছ। স্ত্রীর শোক সে ভুলিতে পারে; কিন্তু এ শোক তো সে কখনো কোনো কালে ভুলিতে পারিবে না। গত ছয় দিন ছয় রাত্রি এই দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে, যতটা স্ত্রীর বিরহে না হউক, তাহার বেশি ওই বৎসরে একশ কুড়ি টাকা খরচের ভয়ে। সেই ভয়েই তাহার ছয় দিন ছয় রাত্রি ঘুম হয় নাই। বকুল ছিল সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার মৃত্যুতে সংসার একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে; কি দিয়া অভয় সে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অভয় আজ ছয় দিন ধরিয়া হৃদিস পায় নাই। স্ত্রী মানুষের মরে, অভয়ের তাহাতে তত দুঃখ নাই। কিন্তু ওই যে কথা আছে, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে—তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভয় ভাগ্যবান হইল কি?

স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার আদৌ দুঃখ নাই। সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ মিলাইয়া দেখিল। না, সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া ছ-ছ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয়? লোকসানের পর এমন করিয়া লোকসান হইলে সে কি করিয়া সহ্য করিবে? না, এই লোকসান সহিয়া সে কখনো সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনার সব কিছুই আছে, সব কিছুই সে নিপুণ হস্তে মৃত বকুলের গা হইতে খুলিয়া লইয়াছে। কাশী হইতে তাহার ছোট বোন সেই যে কারুকার্যখচিত কাচের চুড়ি চারগাছি পাঠাইয়াছিল, সেগুলিও সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে। সব তুলিয়াছে, কিন্তু ভুল করিয়াছে বকুলের কানের ফুল দুটি খুলিতে! এক আনা সোনা দিয়া সে-দুটি সে গড়াইয়াছিল। চুলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে-দুটি শবদেহের সহিত গিয়া চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

সেই কারণে অভয়ের আজ সারারাত্রি ঘুম হইল না। স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ওই ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধকধক করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। আর অভয় কিছুতেই ঘুমাইতে পারেনা।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?